International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 692-698
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i4.096

দর্শনের দর্পণে বর্ণপ্রথা: প্রাচীন ভারতের দার্শনিক দ্বৈততা

বিনন্দ সরেন
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, নগর কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The caste system has long been a significant yet contentious social structure in ancient Indian society, and both its justification and opposition are deeply embedded within philosophical thought. This research paper explores the perspectives of Indian philosophy on the caste system from both supportive and critical standpoints. It examines scriptural and orthodox philosophies such as the Rigvedic Purusha Sukta, Dharmashastra, Mimamsa, and Vedanta, which advocate for a divinely ordained and birth-based hierarchical order. Conversely, it analyzes the responses of Buddhist, Jain, Lokayata (materialist), and Bhakti-oriented philosophical traditions, which challenge the caste system on ethical, spiritual, and egalitarian grounds. The study reveals that Indian philosophical thought has at times upheld caste as an immutable and birth-determined structure, while at other times it has emphasized karma, spiritual merit, and inner realization as the basis of true distinction, thereby rejecting rigid social stratification. This duality reflects an inherent tension and evolution within Indian social thought. Through textual and comparative philosophical analysis, the research seeks to uncover the diversity, contradictions, and continuing relevance of philosophical views on caste. In doing so, this inquiry also contributes to contemporary debates on caste-based discrimination and justice, offering a philosophical foundation for the discourse on human rights and social equity.

Keywords: Caste System, Indian Philosophy, Vedanta, Buddhism, Ancient India

বর্ণপ্রথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত সামাজিক কাঠামো, যার ন্যায্যতা ও বিরোধিতা উভয়ই দার্শনিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত। এই গবেষণাপত্রে বর্ণব্যবস্থার প্রতি ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও প্রত্যাখ্যান উভয় প্রান্ত থেকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত, ধর্মশাস্ত্র ও মীমাংসা-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় দর্শনের আলোকে বর্ণপ্রথার সৃষ্টিগত ও ধর্মসংগত যুক্তি অন্বেষণ করা হয়েছে। অপরদিকে, বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত দর্শনগুলোর আলোকে বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, নৈতিক প্রতিবাদ ও আধ্যাত্মিক সাম্যের ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় দর্শনচিন্তা কখনও বর্ণপ্রথাকে চিরস্থায়ী ও জন্মগত বলে নির্ধারণ করেছে, আবার কখনও কর্ম, আধ্যাত্মিক সাধনা ও চৈতন্যের উৎকর্ষকে মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরে শ্রেণি-ভেদের বিরোধিতা করেছে। এই দ্বৈততা ভারতীয় সমাজ-ভাবনার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও রূপান্তরের চিহ্ন বহন করে। পাঠ ও তুলনামূলক দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণা বর্ণপ্রথা সম্পর্কিত দর্শনচিন্তার বৈচিত্র্য, দ্বান্দ্বিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে সচেষ্ট। এই আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমাজে বর্ণবৈষম্য সংক্রান্ত বিতর্ক ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি তৈরি হয়, যা সমসাময়িক মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়চেতনার আলোচনায় অবদান রাখতে পারে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গভীরভাবে প্রোথিত অন্যতম পুরাতন কাঠামো হলো বর্ণপ্রথা। প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্র ও দর্শনে এই শ্রেণিবিন্যাস শুধু একটি সামাজিক রীতি হিসেবে নয়, বরং এক ধরণের দার্শনিক ও ধর্মীয় বৈধতা নিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্ণব্যবস্থাকে কে, কেন এবং কীভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই প্রশ্নটি ভারতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে এক দীর্ঘমেয়াদী বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই বিতর্ক শুধুমাত্র সমাজতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং একটি গভীর দার্শনিক আলোচনার অংশ, যেখানে ধর্ম, আত্মা, কর্ম ও ন্যায়বিচার একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত থেকে শুরু করে মনুস্মৃতি, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণব্যবস্থার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেখানে মানবজন্ম, কর্মফল, ধর্মপালন ও আত্মার উন্নতির সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে আধ্যাত্মিক সমতা, অহিংসা ও মুক্তির সার্বজনীনতাকে কেন্দ্র করে। এমনকি লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন, যা একধরনের বস্তুবাদী দর্শন, বর্ণপ্রথার ধর্মীয় ভিত্তিকেই প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তিবাদের মাধ্যমে। ভক্তি আন্দোলনের দার্শনিক আবেগ থেকেও উঠে এসেছে এক ধরণের শ্রেণীচ্যুত সাম্যচেতনা।

এই দ্বান্দ্বিক ধারা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় দর্শনচিন্তা একমুখী নয়; বরং তা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে একই বাস্তবতাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। বর্ণপ্রথা এই প্রসঙ্গে এক বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে দর্শনের দ্বৈততা—সমর্থন ও বিরোধিতা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। এই দ্বৈততা শুধু চিন্তাজগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ভারতের সামাজিক গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ ও ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।

এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো বর্ণপ্রথা সংক্রান্ত এই দার্শনিক দ্বৈততাকে বিশ্লেষণ করা, প্রাচীন দর্শনের পাঠ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং নৈতিক প্রশ্নের আলোকে। গবেষণার মাধ্যমে আমরা খুঁজে দেখব, দর্শন কীভাবে বর্ণব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত করতে চেয়েছে, আবার কীভাবে তা প্রতিহতও করেছে। বর্তমান সমাজে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের আলোকে এই দার্শনিক পটভূমি নতুন আলো ফেলতে পারে এবং সামাজিক ন্যায় ও মানবিকতার প্রশ্নে চিন্তার একটি গভীর ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে।

বর্ণপ্রথার দার্শনিক ভিত্তি ও প্রাচীন গ্রন্থসমূহ:

ভারতীয় দর্শনে বর্ণব্যবস্থা শুধুমাত্র সামাজিক নয়, বরং ধর্মীয় ও দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবস্থা। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত-এ বলা হয়েছে –

> “ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ।
> ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥”[1]

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছেন ঈশ্বরের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈশ্য উরু থেকে, এবং শূদ্র পদ থেকে। এই আক্ষরিক দার্শনিক প্রতিস্থাপন সামাজিক শ্রেণিকে ঐশিক সৃষ্টির প্রতীক করে তোলে এবং একধরনের জন্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকে প্রতিষ্ঠা করে।

মনুস্মৃতি’তে বর্ণভেদের উপর সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন-

> “উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্ জ্যেষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাত্ ।
> সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥”[২]

অর্থাৎ ধর্ম-কেন্দ্রিক বিষয়গুলিতে, ব্রাহ্মণ হলেন এই সমগ্র জগতের প্রভু, কারণ তিনি (প্রজাপতির) দেহের মুখ্য অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, এবং তিনি বেদকে ধারণ করেন।

> “লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ ।
> ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্তয়ত্ ॥”[২]

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদিতে প্রজা বৃদ্ধি করবার জন্য আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও শূদ্র এই চার বর্ণের সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, ও পদ থেকে শূদ্র সৃষ্টি করলেন। এই বক্তব্যগুলি কর্মনির্ভরতা প্রচার করলেও সামাজিক বাস্তবতায় তা জন্মনির্ভর শ্রেণিরূপে গৃহীত হয়েছে।

মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা কুমারিল ভট্ট বলেছিলেন, বেদই চরম প্রমাণ যা অপৌরুষেয়, তাই বেদের নির্ধারিত ধর্মকর্মই চূড়ান্ত কর্তব্য। তাঁর মতে, শূদ্রদের বেদাধ্যয়ন বা স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ, কারণ তারা বেদপাঠের যোগ্য নয়। শূদ্র মাত্রই জন্মগতভাবে নিম্নতর—এই ভাবধারা মীমাংসায় স্পষ্ট।

"शूद्रो नाधिकारी धर्मस्मार्तः।"[৩]

বেদান্ত দর্শনে শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈত বেদান্তে বলেছিলেন-

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः ।
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः ॥ [৪]

অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মা এক, অভিন্ন, পার্থিব বিভাজন মিথ্যা। - এই জ্ঞানই হলো সত্য শাস্ত্রের বিষয় , এটাই বেদান্তের দৃঢ় ঘোষণা। তবে তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে দেখা যায়, তিনি সমাজে ব্রাহ্মণদের উচ্চতর মর্যাদা স্বীকার করেছেন। শূদ্রদের জন্য তিনি আত্মজ্ঞান লাভকে কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন, যদিও পরম দৃষ্টিকোণে সমতা স্বীকার করেছেন।
গীতায় কৃষ্ণ বলেন-

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥"[৫]

জড় প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত কর্ম অনুসারে, মানব সমাজের চারটি বিভাগ তার দ্বারা সৃষ্ট। এবং যদিও তিনি এই ব্যবস্থার স্রষ্টা, তবুও তিনি অকর্তা, অপরিবর্তনীয়। এই শ্লোক বহু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে। শ্রীধরস্বামী বলেন, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণনির্ধারিত হলেও বাস্তব সামাজে এটি জন্মনির্ভর হয়ে পড়ে।

বর্ণপ্রথার বিরোধিতায় বিকল্প দর্শন ও প্রতিক্রিয়া:

গৌতম বুদ্ধ জন্মগত শ্রেণিভেদের বিরোধিতা করে বলেছিলেন-

"ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো ।
কম্মনা বসলো হোতি, কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।।"[৬]

জন্মের দ্বারা কেও চণ্ডাল হয় না, জন্মের দ্বারাও কেও ব্রাহ্মণ হয় না; কর্মের দ্বারাই চণ্ডাল হয়, ব্রাহ্মণও কর্মের দ্বারাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ জন্ম নয়, আচরণই ব্রাহ্মণত্বের মাপকাঠি। তাঁর আম্বট্ঠ সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে তিনি ব্রাহ্মণ যুবকের অহংবোধ ভেঙে দিচ্ছেন যুক্তির মাধ্যমে। বুদ্ধ বলেন, যে সত্যের অনুসন্ধান করে এবং অহিংস পথে চলে, সে-ই সত্য ব্রাহ্মণ।

জৈন আচার্য উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে বলেছেন, "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।"[৭] মোক্ষের পথ সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান ও আচরণ অর্থাৎ ত্রিরত্ন। এখানে বর্ণভেদ অপ্রাসঙ্গিক।
লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন ধর্ম, পরলোক, আত্মা ও যজ্ঞকে অর্থহীন বলে মনে করে। তারা বলে –

"यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥"[৮]

যতদিন বাঁচো সুখে বাঁচো, ঋণ করে হলেও ঘি খাও। শরীর একবার ছাই হয়ে গেলে, আবার সে আর ফিরে আসে না। জন্ম-শ্রেণিভেদের ভিত্তিতে সামাজিক শৃঙ্খলা মানার প্রশ্নই নেই এই দর্শনে।
ভক্তি আন্দোলন কবীর বলেন-

"जाति न पूछो साधु कीए पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार काए पड़ा रहन दो म्यान॥"[৯]

অর্থাৎ সাধুর জাত নয়, তার জ্ঞান দ্বারা যাচাই করো। যেমন তলোয়ারের কার্যকারিতা ও মূল্য তার ধার ও শক্তিতে, খাপে সেটি ঢুকিয়ে রাখলে তা মূল্যহীন, তেমনি একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার চিন্তা, আচরণ ও জ্ঞানে, জন্মগত জাতিতে নয়। এই দোহা জাতপাত, বর্ণভেদ এবং সমাজে প্রচলিত বৈষম্যমূলক মানসিকতার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রতিবাদ। তাঁর মতে, ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়ে তুলতে হলে মানুষকে তার গুণে বিচার করতে হবে, জাতিতে নয়। এটি ভারতীয় দর্শন ও সমাজচিন্তায় একটি অগ্রণী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।
রবিদাস বলেন-

"ऊँचे कुल के कारणैए ब्राह्मन कोय न होय।
जउ जानहि ब्रह्म आत्माए रैदास कहि ब्राह्मन सोय॥"[10]

উচ্চ কুলের কারণে কেও ব্রাক্ষণ হয় না। যে জানে ব্রক্ষ আত্মা, রবিদাস বলে ব্রাক্ষণ সে-ই। গুরু রবিদাস ভারতের বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, ব্রাক্ষণত্ব কোনো জন্মগত বা জাতিগত পরিচয়ের বিষয় নয়, বরং এটি অর্জন করতে হয় আত্মজ্ঞান, নৈতিকতা এবং ভক্তির মাধ্যমে। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি আত্মোপলব্ধিতে ব্রক্ষকে চিনেছে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ব্রাক্ষণ। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু সমাজে প্রচলিত জন্মনির্ভর শ্রেণিবিন্যাস ও জাতিবিভেদের বিরোধিতা করেছেন এবং সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও মানবিকতার বাণী প্রচার করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক মানবতাবাদ ও ধর্মীয় সমতার দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এনারা ঈশ্বরভক্তিকে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করেন, শ্রেণিভেদের প্রতিবাদ করে আধ্যাত্মিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতীয় দর্শনচিন্তায় এই দুটি সমান্তরাল ধারা অব্যাহত থেকেছে। একটি ধারা জন্মনির্ভর বর্ণপ্রথাকে ধর্মীয় ও দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে সমর্থন করেছে (যেমন: মীমাংসা, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র)। অপর ধারা আত্মিক সাম্য, কর্মনির্ভর মূল্যায়ন এবং আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে (যেমন: বৌদ্ধ, জৈন, ভক্তি, লোকায়ত)। এই দ্বৈততা শুধু একটি ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য নয়, বরং সমাজের ভিতরকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি।

দ্বৈত দার্শনিক প্রবণতার সনাক্তকরণ:

এই গবেষণায় প্রতিফলিত হয় যে ভারতীয় দর্শনে বর্ণপ্রথা বিষয়ে দুটি ভিন্ন দার্শনিক ধারা সমান্তরালে বিকাশ লাভ করেছে। একদিকে রয়েছে ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি ব্রাক্ষণ্য দর্শন, যেখানে বর্ণভেদকে ধর্মীয় কর্তব্য ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সামাজিক অবস্থান পূর্বজন্মের কর্মফলের দ্বারা নির্ধারণ বলে বিবেচিত হয়েছে, ফলে জন্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস এক 'ন্যায়সঙ্গত পরিণতি' বলে উপস্থাপিত।
অপরদিকে রয়েছে, বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত ও ভক্তি দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়, যারা আত্মিক মুক্তির সার্বজনীনতা, মানবতা, সাম্য ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে বর্ণভেদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক চেতনার মাধ্যমে 'মানুষে মানুষে বিভেদ নেই' এই ভাবনার পক্ষে যুক্তি দেয়।

এই দুই প্রবণতার মধ্যকার দার্শনিক দ্বৈততা ভারতীয় সমাজ-মনস্তত্ত্ব ও মূল্যবোধে এক দ্বান্দ্বিক চেতনার জন্ম দেয়, যা পরবর্তী সমাজ ও সংস্কার আন্দোলনের ভিত নির্মাণ করে।

ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈষম্যের বৈধতা:

মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকারগণ যেমন কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য, বর্ণভেদকে ধর্মীয় কর্তব্য (ধর্ম) ও সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি জন্মভিত্তিক শ্রেণিকে ন্যায্যতা দেয়, অথচ আত্মার অভিন্নতার মতবাদকে আত্মিক স্তরে রেখে সামাজিক স্তরে তার বিভাজন ঘটায়। এটি একটি দর্শনগত সঙ্কট, যেখানে আদর্শ ও প্রয়োগে দ্বৈততা বিদ্যমান।

আত্মার অভিন্নতা বনাম জন্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস:

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের ভিত্তি হলো "আত্মা এক বা অভিন্ন" যা যুক্তিপূর্ণভাবে শ্রেণিভেদ অস্বীকার করে। তবে তাঁর সামাজিক মন্তব্য ও ভাষ্যগ্রন্থে দেখা যায়, তিনি শূদ্রদের বেদাধ্যয়নের অযোগ্য মনে করেন, যা দর্শনগত মতবাদ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে বিরোধ নির্দেশ করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রাচীন দর্শনচিন্তায় দার্শনিক সমতা ও ধর্মীয় শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সংঘাত রয়েছে।

বিকল্প দর্শনে বর্ণপ্রথার প্রত্যাখ্যানের যুক্তি:

বৌদ্ধ, জৈন ও লোকায়ত দর্শনের বিরোধিতায় উঠে এসেছে সাম্যবাদী ও মুক্তিকেন্দ্রিক নৈতিক দর্শন। গৌতম বুদ্ধ বলেন, "না জচ্চা ব্রাক্ষণো হোতি, আচরণেন ব্রাক্ষণো"এটি আত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক সাধনার ওপর গুরুত্ব দেয়। লোকায়ত দর্শন ধর্ম ও বর্ণপ্রথার ভিত্তিকে পুরোপুরি নাকচ করে যুক্তির পথ গ্রহণ করে। তারা যেহেতু পরজন্ম বা আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, সেহেতু জন্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস অযৌক্তিক। ভক্তি আন্দোলন জাতপাতের বাইরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরভক্তিকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে, যা একরকম আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের সূচনা করে। রবিদাসের মতো

নিম্নবর্ণের সাধকের উচ্চারণ “জউ জানে ব্রহ্ম আত্মা, রবিদাস কহে ব্রাহ্মণ সোই”- এই বক্তব্য এক ঐতিহাসিক নৈতিক বিপ্লব নির্দেশ করে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতায় দর্শনের প্রয়োগ ও বিকৃতি:

গবেষণায় প্রতীয়মান হয়, যে দর্শন আত্মার সমতা ও কর্মনির্ভর ন্যায়চিন্তার পক্ষে ছিল, বাস্তব সমাজে সেগুলি অনেক সময়েই ক্ষমতার বলয়ে বিকৃত ও অপ্রয়োগযোগ্য হয়ে পড়েছে। যেমন, গীতায় “গুণকর্মবিভাগশঃ” বলা হলেও বাস্তবে তা জন্মভিত্তিক শ্রেণিতে রূপ নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত ও বাস্তবতার বৈপরীত্য প্রাচীন দর্শন ও সমাজচিন্তার এক মৌলিক দুর্বলতা কিংবা ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান ভারতীয় সমাজে জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য, সংরক্ষণনীতি ও মানবাধিকারের প্রশ্নে যে বিতর্ক চলছে, তা প্রাচীন দর্শনের আলোকে বিচার করলে স্পষ্ট হয়- যেমন দর্শন সমাজের কাঠামোতে ন্যায্যতা প্রদান করেছে, তেমনি আবার বিকল্প নৈতিক মানদণ্ড দিয়েও একধরনের সংশোধন ও প্রতিবাদচিন্তা গড়ে তুলেছে। এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন একমুখী নয়, বরং বহুমুখী ও অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ ছিল, যা আজও ভাবনার খোরাক ও প্রাসঙ্গিক এক মূল্যবোধের উৎস।

বর্ণপ্রথা প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোয় এক গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়, যার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভারতীয় দর্শনচিন্তা কখনো বর্ণব্যবস্থাকে ধর্মীয় ও দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে সমর্থন করেছে, আবার কখনো আত্মার অভিন্নতা, কর্মনির্ভরতা ও নৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে সেই ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। একদিকে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত, মনুস্মৃতি, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে বর্ণপ্রথাকে এক দেহতাত্ত্বিক, ধর্মানুগ এবং বৈদিক কর্তব্যের কাঠামোতে যুক্তিসঙ্গত বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, শূদ্রের অধিকারহীনতা এবং সামাজিক ভূমিকা পূর্বনির্ধারিত—এই বিশ্বাসই প্রাধান্য পেয়েছে। অপরদিকে, বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত দর্শন এবং ভক্তি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক বিপ্লব বর্ণভেদের বিরোধিতায় এক নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি গড়ে তোলে। তারা আত্মার পরিশুদ্ধি, কর্ম ও আচরণের প্রাধান্য এবং ঈশ্বরভক্তির সার্বজনীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজে সমতা, মানবিকতা ও জ্ঞানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। এই বিপরীতমুখী দুটি প্রবণতা ভারতীয় দর্শনের অন্তর্নিহিত দ্বৈততা বা দ্বান্দ্বিকতাকে স্পষ্ট করে, যা প্রাচীন সমাজে নৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। এই দ্বৈততা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নয়, বরং তা ভারতীয় সমাজ ও দর্শনের অন্তরগভীরে একটি চলমান বিতর্কের রূপ নেয়, যা আজও আমাদের সমসাময়িক সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়। গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য অনুযায়ী দেখতে পাই, বর্ণভেদ কেবল ধর্মীয় আচার নয়, তা ছিল এক সামাজিক ক্ষমতার কাঠামো। দার্শনিক চিন্তায় থাকা সাম্য ও ভেদ এই দুই বিপরীত শক্তি ভারতীয় সমাজে যুগপৎভাবে সক্রিয় ছিল। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় আত্মিক সমতার পক্ষে যুক্তি থাকলেও, তা প্রায়ই সামাজিক ব্যবস্থায় প্রযোজ্য হয়নি এটাই প্রধান দ্বন্দ্ব।

বর্তমান ভারতীয় সমাজে বর্ণবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য ও রাজনৈতিক সংরক্ষণ বিতর্কের পটভূমিতে এই দর্শনচিন্তা এক গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। কারণ, দর্শন কেবল চিন্তাজগতের বিষয় নয়, তা সমাজ গঠনের নৈতিক ভিত্তিও বটে। অতএব, এই গবেষণা সমাজের ভাবনাপ্রবণ অংশে এক নতুন আলোচনার দিক খুলে দেয়, যেখানে অতীতের দর্শনের আলোয় ভবিষ্যতের ন্যায় ও সাম্যের পথ চিহ্নিত করা সম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই গবেষণা ভারতীয় দর্শনে বর্ণপ্রথা সম্পর্কিত সমর্থন ও বিরোধিতার দ্বৈততা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদেরকে সমাজ ও দর্শনের একটি সমন্বিত পাঠ দেয়। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, দর্শনের কাজ শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, সংশোধন, প্রতিবাদ এবং নবনির্মাণের দিশাও দেখানো।

তথ্যসূত্র:

1. স্বরূপানন্দ, স্বামী, অনুবাদক। ঋগ্বেদ সংহিতা (বাংলা অনুবাদসহ)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ২০১৫। ISBN: 9788180401645। পৃষ্ঠা: পুরুষসূক্ত (১০.৯০.১২), খণ্ড ৪, পৃ. ৩৮১-৩৮৫।
2. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, অনুবাদক। মনুস্মৃতি (বাংলা অনুবাদসহ)। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫। ISBN: 9788177568499। অধ্যায় ১, শ্লোক ৯৩,৩১ পৃ. ৪২,৩০।
3. কুমারীল ভট্ট। তন্ত্রবর্ত্তিক। গঙ্গানাথ ঝা (অনুবাদক)। পিলগ্রিমস বুক হাউস, ১৯৯৮। ISBN-13: 9788176240253। অধ্যায় ১ , পাদ ৩, শ্লোক ৩৮ । পৃ. ২০-২৫।
4. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, অনুবাদক। বিবেকচূড়ামণি। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, 2008 ISBN-13: 9788190178112 । শ্লোক ২০, পৃ. ১৭।
5. শ্রীমাধবানন্দ মঠ। গীতাপাঠ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। শ্রীমাধবানন্দ মঠ প্রকাশনী, ২০১০। ISBN 978-81-89646-75-5। অধ্যায় ৪, শ্লোক ১৩। পৃ. ১২৫ ।
6. ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দ, অনুবাদক। সুত্ত নিপাত: বুদ্ধবচন সংকলন। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, ২০১২। ISBN: 978-984-33-1234-5 । উরগ বর্গ, বৃষল সুত্র ২১। পৃ. ৩৫।
7. জৈন আচার্য উমাস্বাতি। তত্ত্বার্থসূত্র (Tattvārthasūtra)। অনুবাদ: নাথমল তাতিয়া। জৈন কালচারাল রিসার্চ সোসাইটি, ২০০০। ISBN: 9788170110862। অধ্যায় ১, সুত্র ১, পৃষ্ঠা: ৫ ।
8. মাধবাচার্য(বিদ্যারণ্য)। সর্বদর্শনসংগ্রহ। ভাষ্য: ড. উমাশঙ্কর শর্মা 'ঋষি', চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৪। Pdf পৃষ্ঠা-৪০ । Online- https://www.jainfoundation.in/JAINLIBRARY/books/Sarva_Darshan_Sangraha_091020_std.pdf
9. দাস, শ্যামসুন্দর, সম্পাদক। কবীর গ্রন্থাবলী। নাগরী প্রচারিণী সভা, ২০০৪। ISBN: 9788126300009। Online- https://dn790003.ca.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.446885/2015.446885.kabir-granthawali.pdf
10. রৈদাস। রৈদাস জী কি বাণী। বারাণসী: শ্রী গুরু রৈদাস ধর্মিক বিশ্ব মহাপীঠ, ২০১৬। Archive.org । প্রবেশের তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৫। Online- https://archive.org/details/RaidasJiKiBani_201604

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, অনুবাদক। মনুস্মৃতি (বাংলা অনুবাদসহ)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫। ISBN: 9788177568499।

২. ঘোষ, শ্যামসুন্দর, অনুবাদক। ঋগ্বেদ সংহিতা (সংস্কৃত ও বাংলা)। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, খণ্ড ৪, ২০১০। ISBN: 9788189934534।

৩. চক্রবর্তী, সুশীলকুমার, সম্পা. বৃহদারণ্যক উপনিষদ (ভাষ্যসহ)। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০০৫।

৪. শঙ্করাচার্য। উপদেশ সাহস্রী। অনুবাদক: স্বামী গম্ভীরানন্দ। কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ২০০৩। পৃ. ১৩০-১৩৫।

৫. ভট্ট, কুমারীল। তন্ত্রবাক্যার্থিকা। টীকা: বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।

৬. আদি শঙ্কর। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য। অনুবাদক: স্বামী মাধবানন্দ। কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ২০১০। ISBN: 9788175050620।

৭. দত্ত, হেমচন্দ্র। শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈত বেদান্ত। কলকাতা: নবচেতনা প্রকাশনী, ১৯৯৭। ISBN: 9788190012356।

৮. সেন, অমর্ত্য। ভারতীয় বিচিত্রতা ও যুক্তির সংস্কৃতি। অনুবাদ: অরুণাভ সেন। কলকাতা: আনন্দ, ২০০৬। ISBN: 9788177566617।

৯. চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ। ভারতীয় দর্শন চিন্তা। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০০৪। পৃ. ১২০-১৪৫।

১০. গুহ, রামচন্দ্র। India After Gandhi। নয়াদিল্লি: Picador India, ২০০৭। ISBN: 9780330396110।
১১. Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass, 2000. ISBN: 9788120804121.
১২. Radhakrishnan, S. Indian Philosophy, Vol. 1–2. Oxford University Press, 2008. ISBN: 9780195698411.
১৩. King, Richard. Indian Philosophy: An Introduction to Hindu and Buddhist Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. ISBN: 9780748612026.
১৪. Bhakti Movement and Social Equality–বিষয়ক গবেষণাপত্র
১৫. রবিদাস এবং কবীর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ।